সূচিপত্র

১১	যাত্রার শুরুতে বিস্ময়কর কুরআন
২০	কুরআনের মৌলিক ভাববস্তু
২৮	বহুকাল আগে...নবি-রাসূল ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কথা
৩২	পরকাল : আমার আসল গন্তব্য
৪৩	কেন কুরআনে বিশ্বাস করব
৬১	একটি ধ্রুবতারা; কুরআনের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা
৭২	সাহিত্য সন্ধান; কুরআনের অতুলনীয় সাহিত্যগুণ
৭৯	গঠনামৃত; নির্ভুল কাঠামোয় স্রষ্টার নিদর্শন
৮৯	নির্ভুল ভবিষ্যদ্‌বাণী
১০০	হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস
১২০	আল কুরআনের অনুকরণ অসম্ভব
১২৯	মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনচরিত
১৪০	কুরআনের সামাজিক প্রভাব
১৪৩	কুরআন যেভাবে বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচার ছড়িয়ে দিলো
১৫৩	বিশ্বজুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে কুরআনের ভূমিকা
১৬৪	কুরআনের আয়াতের প্রতিচ্ছবি
১৮৭	রেফারেন্স

যাত্রার শুরুতে বিস্ময়কর কুরআন

কুরআন কী? কীভাবে এলো এই মহাগ্রন্থ

মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা জিবরাইল ﷺ-এর মাধ্যমে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেন। এই গ্রন্থ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে, সকল নবি-রাসূল আল্লাহ কতৃক প্রেরিত। কুরআনের বিভিন্ন দিকসমূহের মধ্যে এই ঘোষণা অন্যতম। কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে ইবরাহিম, মুসা, ঈসা ﷺসহ আরও অনেক নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ নবি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।

পৃথিবীতে কুরআনের প্রভাব অসীম। সপ্তম শতাব্দীতে আরব ভূখণ্ডে কুরআন অবতীর্ণ হলেও এতে রয়েছে সর্বকালের ও সমস্ত ভূখণ্ডের মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য বার্তা (Well Accepted Guidline)।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা প্রায় ১৮০ কোটি, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার চার ভাগের একভাগ। এই বৃহৎ জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও আল কুরআন পাঠ করা হচ্ছে। লাখো মানুষ গোটা কুরআন মুখস্থ করে মনের গহিনে জমিয়ে রাখছে। সযত্নে লিখে রাখছে হৃদয়ের শুভ্র পাতায়। সত্যি, ভাবলে অবাক হতে হয়! কুরআনে এমন কী আছে—যার জন্য শত কোটি মুসলিমের হৃদয়ে এই গ্রন্থ এত মজবুত আসন গাড়তে সক্ষম হয়েছে?

কুরআন একদিকে যেমন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ, অন্যদিকে তেমনি একে নিয়ে মানুষের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির ঘটনাও নেহাত কম নয়। আজকাল সবার মুখেই কুরআন নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়। কুরআনের প্রভাব এতটাই পরিব্যাপক, আপনি এই গ্রন্থের নাম শুনুন বা না শুনুন, পড়ুন বা না পড়ুন—এটা ইতোমধ্যেই কোনো না কোনোভাবে আপনার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কুরআন অজান্তেই আপনার জীবনকে এমনভাবে রাঙিয়ে তুলেছে, যেটা আপনি কল্পনাও করতে পারেননি।

হয়তো ভাবতে পারেন, সব ধর্মই তো নিজেদের ব্যাপারে অলীক সব দাবি করে। আর বইগুলো যখন লেখা হয়েছে, তখন আমরা ছিলামও না, তাহলে আসল ঘটনা জানব কীভাবে? কীভাবে বুঝব এটাই সত্য? তাই ওসবে বিশ্বাস করা কি নিতান্তই অন্ধবিশ্বাস নয়?

মুসলিমরা কেবল বিশ্বাসের জোরে কুরআনকে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ বলে মেনে নেয় না; বরং কুরআন বাস্তবিকার্থেই একটা বিস্ময়ের নাম। এটা জীবন্ত মুজিজা— যা আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করে থাকি। এমন জোরালো দাবির পেছনে অবশ্যই শক্ত প্রমাণ থাকতে হয়। আর এই শক্ত প্রমাণ কুরআন দিয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উদাহরণ দিয়ে এবং মানুষের মধ্যে অতি প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন জাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। প্রমাণের অংশ হিসেবে কুরআন জায়গায় জায়গায় পাঠকদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। মানুষের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন ভুল ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এভাবে মানুষের মধ্যে গেড়ে বসা ভুলগুলোকে উপড়ে ফেলে কুরআন সেখানে স্থাপন করেছে শক্তিশালী সত্যের ভিত।

আপনি যদি ধর্মগ্রন্থগুলো নিয়ে সন্দেহবাতিকতায় ভোগেন, যদি ভাবেন, এসব বই যতসব আজগুবি কথায় ভর্তি—যেগুলোর পর্যাপ্ত কোনো প্রমাণ নেই, তাহলে প্রস্তুত হোন চমকে যাওয়ার জন্য।

এই কুরআন কী শেখায়

জীবনের কোনো না কোনো ধাপে এসে আমাদের প্রত্যেকের মনেই একটা গভীর প্রশ্ন উঁকি দেয়। আর তা হলো—

‘আমি কী ছিলাম? কী করছি? আর আমার গন্তব্যই-বা কোথায়?’

আমরা যখন জীবনের এসব বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করি, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে এই বোধ জাগ্রত হয়, আমাদের একটা শুরু আছে। একটা সময় আমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, কিন্তু এখন আমরা নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি। আমাদের হাত আছে, পা আছে, কান-চোখ-নাক-মুখ সবকিছুই আছে এবং এই সবকিছুকে পরিচালনা করার জন্য একটা মস্তিষ্কও আছে।

কুরআনের মৌলিক ভাববস্তু

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি বিশ্বাস বা তাওহিদ

তাওহিদ হলো কুরআনের সবচেয়ে মৌলিক ভিত্তি। কুরআনের এই সারাংশ নিয়ে নাজিলকৃত সূরা ইখলাসে আল্লাহ বলেছেন—

> ‘বলো, তিনিই আল্লাহ! এক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ-ই নেই।’ সূরা ইখলাস

কুরআনের এই সূরাকে বলা যায় তাওহিদ বা একত্ববাদের ম্যানুফেস্টো। তবে তাওহিদের অর্থ কেবল একত্ববাদ করা হলে সার্বিক ভাব প্রকাশ পায় না। এর অর্থ আরও ব্যাপক। এটা আমাদের বলে—আল্লাহ এক। এই ‘এক’ সেই ‘এক’ নয়, যেখানে এক হয়ে যায় ‘দুই’ আবার দুই হয়ে যায় ‘তিন’; এভাবে বাড়তেই থাকে।

এখানে এক বলতে অদ্বিতীয়ভাবে একত্ব বোঝানো হয়েছে—যার দুই বা তিন হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই; যেমনটা আমরা দেখতে পাই খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের কথার মাঝে।

প্রশ্ন আসে, কীভাবে আমরা জানব আমাদের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়? কেন তা দুই বা তিন হওয়া সম্ভব নয়?

এটার উত্তরের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হবে আল্লাহ প্রদত্ত চিন্তাশক্তির ওপর। কেননা, এই চিন্তাশক্তি আমাদের চারপাশের বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে এবং চিন্তা করতে শেখায়। ব্যাপারটা অনেকটা সেই চিত্র বিশেষজ্ঞের মতো, যিনি কোনো চিত্রকর্মের দিকে তাকিয়ে অঙ্কনের ধরন দেখেই বলে দিতে পারেন—এর শিল্পী কে।

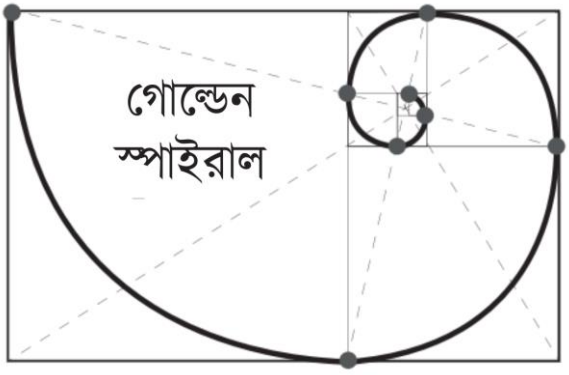

গোল্ডেন স্পাইরাল সম্পর্কে হয়তো জানেন। গোল্ডেন স্পাইরাল এক বিশেষ ধরনের প্যাঁচ, যেমনটা ওপরের চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন। প্রকৃতিতে অনেক সৃষ্টির মাঝেই গোল্ডেন স্পাইরাল দেখা যায়। এই রকম আকৃতির প্যাটার্ন দেখা যায়, এমন কিছু বস্তুর উদাহরণ হলো—আমাদের অতি পরিচিত শামুকের খোলস, গ্যালাক্সির আকার, ঘূর্ণিঝড়ের আকার, ফুল; এমনকী আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টও।

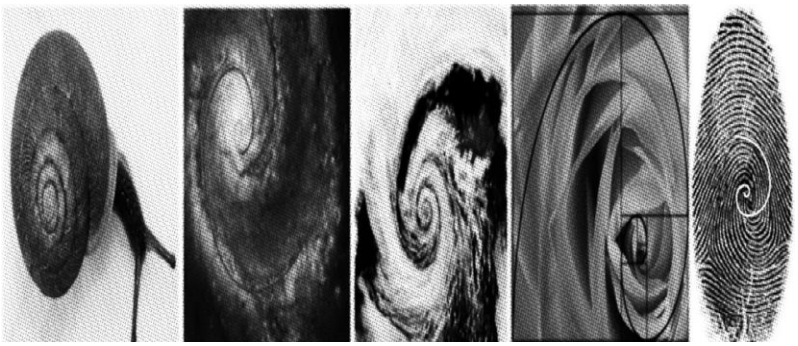

এই প্যাটার্নগুলোকে আপনি ‘একই আদলের নকশা’ হিসেবে ধরতে পারেন। প্রকৃতির এই অভিন্ন আদলের নকশাগুলো দেখিয়ে দেয়, এই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা একজনই।

পরকাল : আমার আসল গন্তব্য

কুরআন থেকে জানতে পারি, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে শুরু হবে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন। আমাদের সবাইকে একসময় মৃত্যুবরণ করতে হবে; ফিরে যেতে হবে মহান রবের কাছে।

> ‘প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদের পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।’ সূরা আম্বিয়া : ৩৫

কিন্তু পৃথিবীতে স্বল্পকালের জন্য আমাদের বসবাসের উদ্দেশ্য কী? কেন আল্লাহ আমাদের একবারেই সেই চিরন্তন জীবন দিলেন না?

কারণ, এটা আমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। পৃথিবীতে থাকার সময় আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।

> ‘আর আমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর (হে নবি) আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের, যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে—“আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।”’ সূরা বাকারা : ১৫৫-১৫৬

মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষক মূলত পরীক্ষার্থীকে যাচাই করে থাকেন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই মানুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর হিকমাহ অপরিসীম। তিনি আমাদের অন্তরের খবরও জানেন। আমরা নিজেদের যতটুকু চিনি, তার চেয়ে অবশ্যম্ভাবীভাবে তিনি আমাদের বেশি চেনেন। আমাদের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন।

> ‘অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ে অবস্থিত ধমনি অপেক্ষাও নিকটতর।’ সূরা ক্বাফ : ১৬

এই পরীক্ষা বা বিপদাপদসহ সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও পরিকল্পনার দ্বারা। আল্লাহ কেন আমাদের পরীক্ষা করেন এবং বিভিন্ন রকমের দুঃখ—কষ্টে ফেলেন?

এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। যেমন—

১. কে সত্যিকারের বিশ্বাসী আর কে মুনাফিক, তা আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য।

> 'মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা বিশ্বাস করি"—এ কথা বললেই ওদের পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি তো এদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলাম। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।' সূরা আনকাবুত : ২-৩

২. যারা দুনিয়ার জীবনে আসক্ত হয়ে পড়ে, দুনিয়াকেই পরম সত্য হিসেবে মনে করে আখিরাতের কথা ভুলে যায়, তাদের জন্য দুঃখ-দুর্দশাগুলো রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করে। এগুলো মানুষকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহর নিয়ামতের ওপর আমরা কতটা নির্ভরশীল।

> 'আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনাকারী হয়।' সূরা ফুসসিলাত : ৫১

৩. মানুষের ধৈর্য অনেক কম। তা ছাড়া ভবিষ্যতের কোনো জ্ঞানও আমাদের নেই। তাই আল্লাহর দেওয়া কোনো পরীক্ষাকে আপাতদৃষ্টিতে ভীষণ তিক্ত ও খারাপ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে।

কেন কুরআনে বিশ্বাস রাখব

ধরুন, নবুয়তের সিলসিলা চালু আছে। একটা অজানা-অচেনা মানুষ এসে দাবি করল, 'আল্লাহ আমাকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমাকে মেনে চলো!'

এ কথা শুনে আপনি প্রথমেই কী বলবেন? নিশ্চয় বলবেন, এই লোকটা আস্ত একটা উন্মাদ! তারপর তার কাছে প্রমাণ চাইবেন। কেননা, এত বড়ো দাবি তো প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা যায় না! বেশিরভাগ মানুষেরই এই প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, এভাবেই মানুষ আশপাশে ছড়িয়ে থাকা মিথ্যুক ও উন্মাদদের থেকে আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বরদের আলাদা করতে পারেন।

আর কুরআনও আমাদের বলে, আল্লাহ তাঁর নবি-রাসূলদের সুস্পষ্ট প্রমাণসমেতই প্রেরণ করেছেন—

> 'নিশ্চয়ই আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে।' সূরা হাদিদ : ২৫

নবি-রাসূলগণ তাঁদের নবুয়ত ও রিসালাতের প্রমাণস্বরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন মুজিজা বা অলৌকিক নিদর্শন লাভ করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে হিদায়াতের পথে ডাকতেন। যেমন : মুসা ﷺ সাগরকে দুই ভাগ করে ফেলেছিলেন। ঈসা ﷺ হাতের স্পর্শে বিভিন্ন রোগীকে সুস্থ করতেন এবং মৃতকে পুনর্জীবিত করতেন ইত্যাদি। কিন্তু এ মুজিজাগুলো ঘটেছিল বহু বছর আগে। বর্তমান যুগে এমন নিদর্শন আমরা দেখতে পাই না। তাই মুমিনদের এসব গ্রহণ করতে হয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুজিজা হলো—আল কুরআন। মুসলিমরা বিশ্বাস করে, নবি-রাসূলদের নিকট প্রেরিত সকল মুজিজার মধ্যে আল কুরআনই শ্রেষ্ঠ। কেননা, এই মুজিজার বিশষত্ব হলো—যে কেউ চাইলেই যে কোনো মুহূর্তে কুরআন পড়তে পারে এবং এই মুজিজার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঠিক কী কারণে কুরআনকে শ্রেষ্ঠ মুজিজা বলা হয়, তা জানতে হলে কুরআনের দুনিয়ায় ক্ষাণিকটা বিচরণ করে আসতে হবে। চলুন তাহলে, দেখে আসি এই গন্থের কিছু অসাধারণ ঝলক...

স্রষ্টার ধারণা

কে তিনি?

কুরআনে ইবরাহিম ﷺ-এর যে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বেশ চমৎকারভাবে স্রষ্টার ধারণা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—

'নিশ্চয়ই ইতঃপূর্বে আমি ইবরাহিমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে আমি সম্যক অবগত। যখন সে তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল—"এই মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ?"

তারা বলল—"আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।"

সে বলল—"তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।"

তারা বলল—"তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, নাকি কৌতুক করছ?"

সে বলল—"বরং তোমাদের প্রতিপালক তো (তিনিই, যিনি) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। শপথ আল্লাহর! তোমরা চলে গেলে তোমাদের এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে আমি অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।"

অতঃপর সে তাদের বড়ো মূর্তিটি ছাড়া বাকি সবগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো—যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে।

তারা বলল—"আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এমন আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারী।"

কেউ কেউ বলল—"আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাঁর নাম ইবরাহিম।"

তারা বলল—"তাঁকে লোকসম্মুখে উপস্থিত করো—যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।"

তারা বলল—"হে ইবরাহিম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ আচরণ করেছ?"

সে বলল—"বরং ওদের মধ্যে এই বড়োটিই করেছে। সুতরাং তোমরা তাকেই জিজ্ঞেস করো, অবশ্য যদি সে কথা বলতে পারে।"

তখন তারা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল এবং একে অপরকে বলতে লাগল—"বরং তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।"

অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল (এবং তারা বলল)— "তুমি তো জানোই যে, ওরা কথা বলতে পারে না।"

সে বলল—"তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না?"' সূরা আম্বিয়া : ৫১-৫৬

সাহিত্য সন্ধান
কুরআনের অতুলনীয় সাহিত্যগুণ

সাহিত্যের কথা ভাবলেই মাথায় আসে বইয়ের পৃষ্ঠায় লিখিত শব্দ, বর্ণ ও উপমার কথা। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি, কুরআন লিখিতভাবে নবির নিকট আসেনি, এসেছে মৌখিকভাবে। তিনি প্রথম প্রচারও করেছেন মৌখিকভাবে; লিখিতভাবে নয়।

অথচ মৌখিকভাবে প্রচার করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে; লেখনীতে যার সম্ভাবনা একদমই কম।

একটু পরিষ্কার করা যাক—

লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ধরুন কোনো সেমিনারে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনাকে বক্তৃতা দিতে বলা হলো। প্রস্তুতির সময়ও দেওয়া হলো একদম কম। ফলে অনেকটা প্রস্তুতিহীনভাবেই আপনাকে বক্তব্য দিতে হবে। সামনে শত শত উৎসুক শ্রোতা। অনেকে তির্যক প্রশ্ন করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এই পরিস্থিতিতে বক্তব্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তা ছাড়া এমন পরিস্থিতিতে গোছালো শব্দচয়নও সব সময় সম্ভব হয় না।

বিপরীত দিকে এই একই বিষয় যদি আপনাকে লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে বলা হয়, তাহলে তা তুলনামূলক বেশি নির্ভুলভাবে হবে। কারণ, তখন আপনি ভেবে-চিন্তে লেখার সুযোগ পাবেন, ভুল হলে আবার সম্পাদনা করে সংশোধন করার ফুরসত পাবেন। ভাষায় লালিত্য আনার সুযোগ পাবেন। নিখুঁত শব্দচয়নে মনোযোগী হতে পারবেন।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, লেখনির চেয়ে মৌখিক কথায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

তাহলে প্রশ্ন জাগে, কুরআন মৌখিকভাবে প্রচারের পরও কেন এত নির্ভুল? কীভাবে সম্ভব এত বাগাড়ম্বর ও নিখুঁত শব্দচয়ন?

এটাই কুরআনের বিস্ময়!

বিভিন্ন উদ্ভত পরিস্থিতির পেক্ষাপটে কুরআনের আয়াত নাজিল হতো এবং তা সাথে সাথেই রাসূল ﷺ অন্যদের জানিয়ে দিতেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন মানুষ এসে রাসূল ﷺ-কে হঠাৎ প্রশ্ন করতেন; এগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য কুরআনের আয়াত নাজিল হতো এবং নবিজি সাথে সাথেই মানুষকে মৌখিকভাবে শুনিয়ে দিতেন। যেমন : কুরআনের কিছু আয়াতে দেখা যায়—

> 'আর তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, "রুহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদের জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেওয়া হয়েছে।"' সূরা বনি ইসরাইল : ৮৫

> 'তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দুটোয় রয়েছে বড়ো পাপ এবং মানুষের জন্য উপকার, তবে তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়ো। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে—তারা কী ব্যয় করবে। বলো, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা চিন্তা করো।' সূরা বাকারা : ২১৯

নবিজি ﷺ যদি কুরআনের আয়াতগুলো নিজ থেকে বানিয়ে বলতেন এবং প্রচার করতেন, তাহলে সেখানে ব্যাপক ভুল থাকার সম্ভাবনা ছিল। এত নিখুঁত শব্দচয়ন কখনোই সম্ভব হতো না।

এই বিষয়গুলোরই ইঙ্গিত দেয়—কুরআন মানুষের বানানো কোনো কথা নয়; বরং মহান স্রষ্টার কথা। তিনি সর্বদা 'ওয়েল প্রিপিয়ার্ড'। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত—সব ব্যাপারেই তিনি জ্ঞাত। তাঁকে কোনো কিছু ভাবতে হয় না, প্রস্তুতি নিতে হয় না। তাই যে পরিস্থিতেই তাঁর পক্ষ থেকে কথা আসুক না কেন, তা হয় অতি নিখুঁত, নির্ভুল, গোছালো ও সত্য তথ্য সংবলিত।

বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য কুরআনের অসাধারণ সাহিত্য গুণাবলির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাক—

১. সূক্ষ্মতা

> 'আল্লাহ কোনো ব্যক্তির দেহাভ্যন্তরে দুটি হৃদয় রাখেননি। তোমাদের যেসব স্ত্রীকে তোমরা "জিহার" করো, তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের জননীও করেননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। এসব তো হচ্ছে এমন ধরনের কথা—যা তোমরা সম্মুখে উচ্চারণ করো। কিন্তু আল্লাহ এমন কথা বলেন, যা প্রকৃত সত্য এবং তিনিই সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।' সূরা আহজাব : ৪

এই আয়াতটির لِرَجُلٍ শব্দটি দ্বারা পুরুষদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে (رَجُلٌ অর্থ : পুরুষ) তাই এর সঠিক অর্থ দাঁড়ায়—

> 'তিনি কোনো পুরুষের ভেতর দুটো হৃদয় স্থাপন করেননি।'

লক্ষ করুন—যদি এর সাথে মহিলাদেরও ইঙ্গিত করা হতো, তাহলে رَجُلٌ শব্দটির জায়গায় 'ইনসান' শব্দ ব্যবহার করা হতো। তখন তার অর্থ হতো— তিনি কোনো মানুষের ভেতরে দুটো হৃদয় দেননি। ফলে তা সঠিক ব্যাখা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াত। কারণ, নারী গর্ভবতী অবস্থায় নিজের ভেতর সন্তানের হৃদয়কেও ধারণ করে, পুরুষ নয়।

সুবাহানাল্লাহ! ভাবের কত সূক্ষ্ম প্রকাশ!

২. বলিষ্ঠ ভাষার ব্যবহার

> 'তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি তা (কুরআন) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে (নাজিল) হতো, তবে অবশ্যই এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।'
> সূরা নিসা : ৮২

আল্লাহ বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, এখানে কোনো বৈপরীত্য বা স্ববিরোধী কথা পাওয়া যাবে না। এটি খুবই রাশভারী কথা। কিন্তু এই রাশভারী কথারও অতি সস্তা ব্যাখ্যা করে কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায় একটি 'অন্ধকারে হাতরে বেড়ানো' সম্প্রদায়।

আল্লাহ বলেছেন—কুরআনে কোনো 'বৈপরীত্য বা Contradiction' নেই। এই পারিভাষিক বিষয়টাকে তারা কেবল 'শব্দ (Word)' হিসেবে ধরে নেয় এবং এই শব্দটা কুরআনে কতবার আছে, তা খোঁজা শুরু করে দেয়। তারা গুগলে সার্চ করে যখন দেখে এই শব্দটি একাধিকবার আছে, তখন তৃপ্তি সহকারে বলে বেড়ায়—'এই দেখুন, কুরআনে অনেক বৈপরীত্য আছে। তার মানে কুরআন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসেনি। কুরআন দিয়েই কুরআন ভুল প্রমাণিত হলো...'